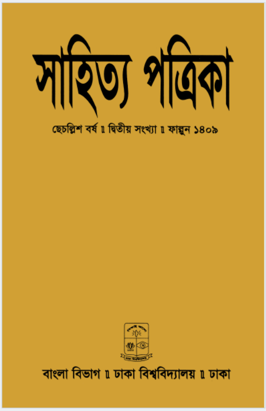

Vol. 46 | No. 2 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও কাজী মোতাহার হোসেন

Volume	46
Issue	2
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এম. এম. নজমুল হক
Published online	February 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i2.339
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i2.339
Pages	১২১-১৫০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও কাজী মোতাহার হোসেন

Check for updates

এম. এম. নজমুল হক★

গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালি মুসলমান সমাজের সামাজিক বিবিধ সমস্যা, ইসলামের বিধি বহির্ভূত প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার, আচরণ ইত্যাদি থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য ১৯২৬ সালের ১৭ জানুয়ারি[১] ঢাকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রের প্রয়াসে জন্ম হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামক একটি প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠনের। বস্তুত বাঙালি মুসলমান তথা বাঙালি জাতির অগ্রগতির ইতিহাস বিনির্মাণে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চিন্তাচর্চাভিত্তিক যে সব সংগঠন যথেষ্ট অবদান রেখেছে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তাদের মধ্যে অন্যতম। এর নামের সঙ্গে 'সাহিত্য' শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি গতানুগতিক ও মামুলি কোন সাহিত্য সংগঠন ছিল না। সাহিত্য শব্দটিকে এর সংগঠকেরা গ্রহণ করেছিলেন একটি বৃহত্তর তাৎপর্যে।

মুক্তবুদ্ধিভিত্তিক চিন্তাচর্চা ছিল তাঁদের সাহিত্যচর্চার মৌল উদ্দেশ্য। কেননা তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, 'বুদ্ধির মুক্তি' না ঘটলে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন সমাজের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তাঁদের সমুদয় কর্মকাণ্ডকে তাই তাঁরা অভিহিত করেছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' নামে। সংগঠনের বার্ষিক মুখপত্র ছিল 'শিখা' (১৯২৭)। এতে সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, অভিভাষণ এবং সংগঠনের কার্যবিবরণী ছাপা হত। 'শিখা'র টাইটেল পৃষ্ঠায় 'মুখবাণী' (Motto) হিসেবে ছাপা হত 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এটিই ছিল তাঁদের জীবনদর্শন। এ দর্শন-নির্ভর চিন্তা-উপলব্ধিকে তাঁরা সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়ে সমাজের মাঝে নবজাগরণের আদর্শকে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন উক্ত সমাজের প্রধান তিন সংগঠকের অন্যতম। কাজী আবদুল ওদুদকে বলা হত এ প্রতিষ্ঠানের 'মস্তিষ্ক', আবুল হুসেনকে 'হস্ত' এবং তাঁকে 'হৃদয়'।[২] 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সাথে কাজী মোতাহার হোসেনের সংশ্লিষ্টতা, অবদান এবং সাহিত্য সমাজের মূলমন্ত্র 'বুদ্ধির মুক্তিবাদ' তাঁর চিন্তা ও

★ প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, খানবাহাদুর আহছানউল্লা কলেজ, সাতক্ষীরা

কর্মে কতখানি রূপায়িত হয়েছে তাঁর মূল্যায়নই বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তদুপরি এ আলোচনার স্বার্থে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' তথা 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র স্বরূপ-প্রকৃতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

দুই

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সূচনা সভা [১৭ জানুয়ারি ১৯২৬; ৩ মাঘ, ১৩৩২ বাংলা] অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ইউনিয়ন রুমে। এতে সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫–১৯৬৯)। উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুদল কাদির প্রমুখ সাহিত্যামোদী ব্যক্তিবর্গ।[৩] সভায় আবুল হুসেনকে সম্পাদক এবং এ. এফ. এম. আবদুল হক, আব্দুল কাদের, আনোয়ার হোসেন ও আবুযোহা নূর আহমদ (১৯০৭–'৭৩)-কে সদস্য নির্বাচত করে প্রথম বছরের জন্য 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর কর্মী সংসদ গঠন করা হয়।[৪] উল্লেখ্য যে, এ বছর সাহিত্য সমাজের কোন সভাপতি ছিলেন না।[৫] কাজী আনোয়ারুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন নেপথ্যে থেকে সবরকম দায়িত্ব পালন করতেন। অনুরূপভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল ফজলও এই সাহিত্য-সংস্থার সাথে প্রথম থেকেই সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।[৬] সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে যোগ দিতে কুমিল্লা থেকে আসতেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, প্রবন্ধ পড়েছেন, গান গেয়েছেন, আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, সভাপতিত্ব করেছেন কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭–১৯৩৮), আহমদ ফজলুর রহমান (স্যার এ. এফ. রহমান), খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ, মমতাজ উদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ হাসান, খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খান (১৮৮৯–১৯৬৪), আবুল মজফফর আহমদ, মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, হেমন্তকুমার সরকার, নাজির উদ্দীন আহমদ, আব্দুর রব চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), হাকিম হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ কাসেম, দিদারুল আলম, সুশীলকুমার দে, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, আকবর উদ্দীন, কামাল উদ্দীন,

বিপিনচন্দ্র পাল, কালিকারঞ্জন কানুনগো, আশুতোষ ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিমল কুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, শামসুল হুদা, কুলচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৭] সাহিত্য সমাজের নামের সাথে 'মুসলিম' বিশেষণ পদটি যুক্ত থাকার কারণে এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, এটি কোন গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথবা এটি কেবল মুসলমানদেরই সংগঠন। কিন্তু সাহিত্য সমাজের সংগঠকেরা এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাই সাহিত্য সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করে সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৩৩) সম্পাদক আবুল হুসেন তাঁর বার্ষিক বিবরণীতে বলেছেন :

> এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সংযোগ সাধন।...
>
> আপনাদের কেহ কেহ হয়ত মনে করবেন এ সমাজের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হওয়ায় হিন্দু সাহিত্যিকগণের কোন সম্পর্ক এতে নাই। কিন্তু এই বার্ষিক বিবরণ হতে আপনারা বুঝবেন যে এ-সমাজ কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য; আর সেই সাহিত্যে মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।[৮]

সাহিত্য সমাজের অন্যতম সংগঠক কাজী মোতাহার হোসেনের নিম্নোক্ত মন্তব্যটুকুও উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার পরিপূরক। তিনি বলেছেন :

> ...বুদ্ধি ও জ্ঞানকে উচ্চস্থান দেওয়া হত বলে পাছে তৎকালীন পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজ যাতে আমাদেরকে ইহুদি ও পৌত্তলিক মনে না করেন সেই জন্যই (বোধ হয়) সতর্কতাসূচক 'মুসলিম' শব্দটা অগ্রভাগেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।[৯]

সাহিত্য সমাজের দু'জন প্রধান পুরুষের উপর্যুক্ত বর্ণনা ও মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, যুগের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা সংগঠনের নামকরণে 'মুসলিম' শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। কেননা সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া তৎকালীন মুসলমান সমাজের কাছে উদার চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির আবশ্যকতা তুলে ধরা তখন বিশেষভাবে দরকার ছিল. যে কারণে তাঁরা বিশেষভাবে বাঙালি

মুসলমানের সমস্যাদি নিয়ে ভেবেছেনে এবং সেগুলোর সমাধানের পথ নির্দেশনা দিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁরা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কল্যাণ চিন্তা করেছেন। বিশেষত সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা খুবই উদগ্রীব ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন চেয়েছেন।[১০]

বস্তুত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র লেখকদের প্রায় সকলেই ছিলেন হৃদয়বান ও আদর্শবান মানুষ এবং ধর্মনিরপেক্ষ তথা অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। আর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে পেরেছিল সাহিত্য সমাজের অধিবেশনসমূহে পূর্বোল্লিখিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি, আলোচনায় অংশগ্রহণ, প্রবন্ধপাঠ ও স্বাধীন মতামত প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড তার পরিচয় বহন করে।

তিন

রেনেসাঁস বলতে যা বুঝায় তার সার্থক রূপায়ণ হয়ত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র লেখকদের জীবনে হয় নি। কিন্তু রেনেসাঁর কয়েকটি বড় লক্ষণ তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিল। অন্ধঅনুবর্তিতা বর্জন, জ্ঞান পিপাসা, যুক্তিবাদিতা, পৃথিবীর মানস সম্পদ আহরণ করে জীবনকে সমৃদ্ধ করা, ললিতকলার চর্চা করে জীবনকে সুন্দর করা... এ সবেরই প্রেরণা তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[১১] এ সব প্রেরণা তাঁরা লাভ করেছিলেন রেনেসাঁসের আদর্শে উজ্জীবিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাণ-পুরুষদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি থেকে। সাহিত্য সমাজের ভাবযোগী কাজী আবদুল ওদুদ এ সম্পর্কে বলেছেন :

> নজরুলের অভ্যুদয়ের পরে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'মুসলিম সাহিত্যিক সমাজ', মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা' আর তাঁদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি', Emancipation of the intellect, এই মন্ত্র তাঁরা... পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে... কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তফের লেখক রোমাঁ রোলার কাছ থেকে, আর হযরত মোহাম্মদের কাছ থেকে।[১২]

সাহিত্য সমাজের উদ্যোক্তাদের অন্যতম এবং প্রথম বছরের কর্মী সংসদের সদস্য (সহকারী সম্পাদক) আবদুল কাদির তাঁদের প্রেরণার উৎস হিসাবে ডিরোজিওর নামও উল্লেখ করেছেন।[১৩]

উল্লিখিত মনীষীবর্গের প্রেরণালব্ধ চিন্তা-চেতনা দ্বারা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর লেখকেরা যে নবজাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তদ্দ্বারা তাঁরা চিন্তার গতানুগতিকতা ও ঐতিহ্যের অন্ধঅনুবর্তিতা থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি মুসলমানের কোন বিশেষ সমস্যা নয়, এর সর্বব্যাপী সমস্যা নিয়েই তাঁরা ভেবেছেন। এ সম্পর্কে আবদুল হক লিখেছেন :

> এর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার, পরিবার জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামি, অতীত মুখীনতা, পশ্চিম মুখীনতা, ললিতকলা বিমুখতা, শিক্ষা সমস্যা, কোন কিছুকেই 'সাহিত্য সমাজ' এড়িয়ে যেতে চান নি, সবকিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন...[১৪]

সাহিত্য সমাজের লেখকগণ তাঁদের চিন্তাধারাকে বাঙালি সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য প্রধানত তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছিলেন :

ক. পত্র-পত্রিকার প্রকাশ;

খ. সাধারণ অধিবেশন ও বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা এবং

গ. প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ।

সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৩৩) 'প্রকাশকের নিবেদন'-এ তাই বলা হয়...

> 'শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন। 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে।

সাহিত্য সমাজপন্থীরা অভাব বলতে সমাজ ও আত্মিক উভয়বিধ দৈন্যের কথা বলেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, শিক্ষা ও মানসিক বৃত্তির অসমতা, পর্দা প্রথার আধিক্যজনিত ব্যবধান ইত্যাদি কারণে সমাজে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের ভিতর ঠিক প্রাণে, কর্মে, ভাবনায় মিল হচ্ছে না। নারীকে পুরুষের স্বার্থের বশে স্তুতি বাক্যে ভুলিয়ে রাখা, দেবী সাজিয়ে 'গৃহ কারাবন্দিনী' করে রাখাকে তাঁরা অত্যন্ত দোষাবহ এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের তথা সমাজের উন্নতির পরিপন্থী মনে করেছিলেন। রুচিসম্মতভাবে এবং প্রয়োজনানুরূপ শরীরকে আবৃত রেখে বাইরে এসে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে নারীকে

পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করে সমান অধিকার ও সম্মান আদায় করে নিতে হবে বলে সাহিত্য সমাজের লেখকেরা মনে করতেন। আর সে জন্য যে প্রয়োজন শিক্ষার তাও তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন।[১৫] সাহিত্য সমাজ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, একবার ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করে মুসলমান সমাজ দুদর্শার শিকার হয়েছে, নারী শিক্ষার বিরোধিতা বা উদাসীনতার পরিণতি হবে তদপেক্ষা শোচনীয়।[১৬]

সাহিত্য সমাজের লেখকেরা নারীর সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে উভয়ের সমান অধিকার প্রদান, উত্তরাধিকার, উচ্চশিক্ষা, চাকরি ও ভোটাধিকারের ব্যাপারে প্রকারভেদ তুলে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[১৭] এমন কি কাজী আবদুল ওদুদ বহুবিবাহ সমর্থনযোগ্য হলে বহু স্বামী গ্রহণকেও সমর্থন করার কথা বলেছেন।[১৮] আজকের দিনে মুসলিম মহিলারা যেভাবে সাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল পদক্ষেপে বহির্জগতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে, পৌনে এক শতাব্দী আগে তা ছিল কল্পনার বস্তু। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহিত্য সমাজের উপর্যুক্ত চিন্তা ও কর্ম ছিল তাই অতি আবশ্যক।

ললিতকলার চর্চা ও তার সমর্থন ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বলতর দিক। চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি ছাড়া মুসলমান সমাজ নিরানন্দময় হয়ে পড়েছিল বলে তাঁরা মনে করেছেন। সুরুচি ও আর্টের সমবায়ে আনন্দ বড় সুন্দর মূর্তি লাভ করে বলেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ইসলাম ধর্মে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ, মোল্লাদের এমন বিরোধিতার তাঁরা সমালোচনা করেছেন। মুসলমান সমাজের নিষিদ্ধ গান সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনের উদ্বোধন কিংবা শেষে পরিবেশন করা প্রায় একটা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়। সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দু গায়ক-গায়িকা ছাড়াও কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ হোসেন খসরু, আবদুস সালাম খাঁ, রফিক উদ্দীন আহমদ, জোয়াদুল করিম, আবুল মনসুর প্রমুখ মুসলিম গায়ক ছিলেন। এছাড়া মোতাহার হোসেনের দুই কন্যা (নামোল্লেখ নেই), কুমারী জিয়াউন্‌নাহার, মিস জোবেদা প্রমুখ মুসলিম মেয়েরাও গান গেয়েছেন সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে।[১৯]

১৯৩৪ সালের ২১ ডিসেম্বর কার্জন হলে সাহিত্য সমাজের নবম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব এ. এফ. রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের চার জন ছাত্র একত্রে সমস্বরে গান করেন।[২০] যে কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রীর সঙ্গে কোন ছাত্র কথা বলতে চাইলে

কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন হতো[২১] সে-সময় সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে এ জাতীয় উদ্যোগ ও ঘটনা সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে।

মাতৃভাষা প্রীতি ও এর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কর্মীদের চেতনায় লালিত বিষয়সমূহের অন্যতম দিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙালিকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল; কিন্তু সাহিত্য সমাজের কর্মীদের আলোচনা করতে হয়েছিল এরচেয়ে মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে। ৪ এপ্রিল ১৯২৬ তারিখে সাহিত্য সমাজের প্রথম বর্ষের ৩য় অধিবেশনে বাংলা ভাষা ইসলামের অনুপযোগী এবং 'বাংলা ভাষা মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া অনুচিত' স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২)-এর এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব খাড়া করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, খন্দকার ফয়জুদ্দীন প্রমুখ আলোচনা করেন। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সেদিনের সে-আলোচনা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশে সভায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অগত্যা আলোচনা পরবর্তী কোন অনুষ্ঠানের জন্য স্থগিত রেখে সে-দিনের সভার কাজ শেষ করা হয়।[২২]

বাংলার অভিজাত বংশীয় কোন কোন নেতৃস্থানীয় মুসলমান সে-সময়ে উর্দুকে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চালু করতে চেয়েছিলেন, বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। সাহিত্য সমাজকে তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়।

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা নিয়েও সাহিত্য সমাজকে ভাবতে হয়েছিল। দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সেকেলে পদ্ধতির শিক্ষা দ্বারা কোনরূপ জোড়াতালি দিয়ে কাজ সারার ব্যবস্থা দেখে তাঁরা মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠ ছিলেন। আবুল হুসেন তাঁর 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের দুর্গতির কারণ হিসেবে বুদ্ধির আড়ষ্টতা, অন্ধবিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং আধুনিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীনতাকে চিহ্নিত করেছেন। আর সে জন্য তিনি সমকালে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে অনেকাংশে দায়ী করেছেন।[২৩] সাহিত্য সমাজের ৩য় বর্ষের ২য় অধিবেশনে পঠিত 'বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা ২য় ভাগ' প্রবন্ধে শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> হিন্দু মুসলমানের ভিতর শিক্ষার অসমতা দূর করা দরকার। আবার রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য একই আদর্শের শিক্ষা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এ জন্য হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান না করিয়া একই

> স্থানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। মাদ্রাসায় যে এক নতুন প্রণালীর শিক্ষাবিধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সমাজের ও ছাত্রদের মঙ্গলের জন্যই কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। আদর্শ শিক্ষার দ্বারা প্রীতি ও ঔদার্য বৃদ্ধি পায়। জীবন ধারণের ক্ষমতা জন্মে, নূতন নূতন সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।[২৪]

সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ তাঁর অভিভাষণে বলেছেন :

> মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা-বিষয়ে তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেশি হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি।[২৫]

বস্তুত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমাজে সাহিত্য-সমাজের লেখকদের এসব বক্তব্য ছিল সময়েরই দাবি।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর লেখকেরা সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে তেমন মাথা ঘামান নি, কারণ তাঁরা রাজনীতিক ছিলেন না; সাহিত্য ও সমাজচিন্তাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তদুপরি সমকালে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন না। 'স্বদেশ প্রেমিক স্বজাতিবৎসল মানবহিতৈষী' স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সাহিত্য সমাজ তার প্রথম বর্ষের সপ্তম অধিবেশন স্থগিত করে।[২৬] পঞ্চম বর্ষের প্রথম অধিবেশনে দুটো প্রস্তাব পাশ করা হয় সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই। প্রথম প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ ও শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বাংলা পুলিশের আই. জি. মি. মোমেনের হত্যার জন্য নিন্দা ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়।[২৭] এ ছাড়া সাহিত্য-সমাজের কর্মী আবদুস সালাম এক আলোচনায় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিক্ষোভের কারণ হিসেবে মূলত রাজনৈতিক মতানৈক্যকেই দায়ী করেছেন।[২৮]

সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই ছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-কর্মীদের মূল উদ্দেশ্য। আর ধর্মীয় অন্ধতা সে-বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দাঁড়িয়েছিল, তাই তারা ধর্ম-সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে তাঁদের ছিল গভীর আস্থা এবং এর প্রবর্তক

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর প্রতি সাহিত্য সমাজ কর্মীদের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তবে সাধারণ বিশ্বাসীদের মত তাঁরা কোন আদর্শের প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান নি। পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চাইতে মানুষ মুহম্মদের জীবনের প্রতি তাঁরা নজর দিয়েছিলেন বেশি। তাঁরা হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনের মানবীয় দিকগুলোকে পরিস্ফুট করে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বিচার করেছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে।[২৯]

তাঁদের রচনায় ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে অনিবার্যভাবেই। কিন্তু ধর্মচিন্তাকে তাঁরা সরাসরি বিশ্লেষণ করেন নি। কেননা, ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করা তাদের অভীষ্ট ছিল না; জীবনকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সে-জন্য তাঁরা ধর্মের বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের চেয়ে এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসলমান সমাজকে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে,

> ইসলামের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য। কেবল বিধি-নিষেধগুলি হুবহু পালন করিবার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে— পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর কল্যাণ নাই।[৩০]

কাজী আবদুল ওদুদ ধর্ম বলতে প্রধানত আত্মার উন্নতি, জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনাকে বুঝিয়েছেন। আচার অনুষ্ঠানকে সে তুলনায় তিনি বিবেচনা করেছেন গৌণ দিক হিসাবে।[৩১] আর কাজী মোতাহার হোসেন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অন্ধভাবে পালন করার পরিবর্তে ধর্মকে বিচার করেছেন মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা। চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত 'ধর্ম্ম ও শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> সব সময় মনে রাখতে হবে, লোকহিতই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; ধর্ম্মকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে, কোথাও একটা গোলযোগ আছে। হয়, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধ হয় নাই, নয়ত ধর্ম্মের সে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্ত্তমান অবস্থায় তা অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।[৩২]

ইতঃপূর্বে সাহিত্য সমাজের মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পাদক হিসেবে দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণীতে তিনি বলেছিলেন :

> আমরা চক্ষু বুঁজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না,... আমরা চাই চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ-আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান-শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকা মুক্ত করিয়া ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না... আমরা চাই বর্ত্তমান মুসলিম সমাজের বদ্ধ-কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না... আমরা চাই কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যৎকে মহিমা-মণ্ডিত করিতে। আমরা জীবনকে 'ভোজের বাজি' মনে করিয়া ঐহিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না... আমরা চাই জগতের সমুদয় জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান, বলবান ও ঐশ্বর্য্যবান হইয়া জীবনের পরিধি বর্দ্ধিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে।[৩৩]

এভাবে চোখ বুজে সব কিছু মেনে নেয়ার পরিবর্তে যুক্তির সাহায্যে বিচার করে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ও প্রবণতার কারণে তাঁরা চিন্তার জগতে এক বিশিষ্ট আসন দখল করে আছেন। এদিক দিয়ে মো'তাজিলা সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সগোত্রতা লক্ষ করা যায়। কেননা মো'তাজিলা সম্প্রদায়ের ন্যায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-পন্থীদেরও চিন্তাধারা ও অনুসন্ধানের মূলমন্ত্র ছিল যুক্তিবাদ।[৩৪] যুক্তির সাহায্যেই তাঁরা মানব জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ও কর্মপন্থা নির্ণয় করেছেন। ইসলাম ধর্মের নিষিদ্ধ সুদকে তাই সাহিত্য-সমাজপন্থীরা শাস্ত্রের নিরিখে বিচার না করে যুগের চাহিদা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করেছেন। সুদকে তারা দেখেছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে।[৩৫]

উপর্যুক্ত তথ্য ও প্রমাণের আলোকে বলা যায়, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর লেখকেরা ধর্মকে আত্মিক ও পার্থিব উভয়বিধ উন্নতির সহায়করূপে দেখেছিলেন। আর ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের প্রগতিবিরুদ্ধ ধ্যান-ধারণা ও প্রথানুবর্তিতা সে উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই তাঁরা সেগুলোকে মানতে চান নি; পরিহার করতে বলেছেন।

চার

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পিছনে ভাবযোগী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ কিন্তু কর্মযোগী ছিলেন আবুল হুসেন; আবুল ফজলের এই মন্তব্যটি পুনর্বিবেচনার কথা বলেছেন পরবর্তী কালের জনৈক প্রাবন্ধিক।[৩৬] আমাদের বিবেচনায়ও দাবিটি অমূলক নয়। কেননা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতা ও অবদান বিচার করলে দেখা যায় কাজী ওদুদের পরেই যে নামটি উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের জন্য সাহিত্য সমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। সমাজের মুখপত্র 'শিখা' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন উক্ত দু'বছরের জন্য। তাছাড়া 'শিখা' প্রকাশে সহযোগিতাও করেছেন বিভিন্ন সময়ে। সাহিত্য সমাজের কর্ম-সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১০ম ও ১২শ বছরের। সাহিত্য সমাজের ৫ম বর্ষের ৫ম অধিবেশন (১৮/ ১/১৯৩১), ৮ম বর্ষের ৪র্থ অধিবেশন (৮/১/১৯৩৪) এবং ৯ম বর্ষের ১ম অধিবেশন (১৩/৮/১৯৩৪) তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সমাজের ২৮টিরও অধিক সভায় তিনি উপস্থিত থেকেছেন। অধিবেশনে তিনি গান গেয়েছেন একাধিক বার, ১টি গল্প ও ১৬টি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অন্যের পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেছেন। তাঁর বাসাতেই অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সমাজের ৮ম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনটি।[৩৭]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অধিবেশনসমূহে পঠিত কাজী মোতাহার হোসেনের প্রবন্ধসমূহ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত এ সব প্রবন্ধের অধিকাংশ মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। সাহিত্য সমাজের অধিবেশনসমূহে পঠিত প্রবন্ধসমূহ আলোচনা করলে এ মন্তব্যের যথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন (ফেব্রুয়ারি ১৯২৭)-এ পঠিত হয় কাজী মোতাহার হোসেনের 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধটি। সঙ্গীত তথা ললিতকলার প্রতি সুগভীর অনুরাগবাহী উক্ত প্রবন্ধে তিনি সঙ্গীতকে সুকুমার বৃত্তির পরিপোষক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে রসানুভূতি মানব জাতির 'প্রকৃতি-দত্ত অমূল্য সম্পদ'। তাই তাকে শাস্ত্রের আবরণ দিয়ে কখনো ঢেকে রাখা যাবে না বলে তিনি মনে করেন। তিনি লক্ষ করেছেন সঙ্গীতের বিরোধিতাকারী আলেম সমাজও আজান, মিলাদ প্রভৃতি ধর্মীয় উপাসনায় প্রকারান্তে সঙ্গীতকেই গ্রহণ ও লালন করেছেন। ইসলামের প্রথম দিকে লোকের

মন আধ্যাত্মিক উন্নতির চিন্তায় অতিশয় ব্যাগ্র থাকায় এবং ধর্মাভ্যাস হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স)-এর সঙ্গীতের উপকারিতা অস্বীকার করায় সঙ্গীতের উপযুক্ত অবসর তাঁরা পান নি, কিন্তু ইসলামের গৌরব যুগে সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চর্চিত হতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে সঙ্গীত আরবদের শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। ১৩ ও ১৪ শতকে আরবীয় সঙ্গীত বেশ পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আরবদের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীতেও আরবদের নিকট বিশেষত আরবাধিকৃত স্পেনের নিকট ইউরোপের ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন।

আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের উপর মুসলমানদের প্রভাবের কথাও তিনি সবিস্তার বর্ণনা করেছেন প্রবন্ধটিতে। ভারতীয় সঙ্গীত ও আরব পারস্য-সঙ্গীত সমপ্রকৃতির হওয়ায় এদেশের মোগল-পাঠান বাদশাহদের পক্ষে তার রস গ্রহণ সহজ হওয়ার কারণে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন...

> বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান বাদশাহরা এ দেশের সঙ্গীতকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তৎসহ আরব-পারস্যের নূতন রাগ রাগিণীর সংমিশ্রণে অতিবৈচিত্র্যময় মনোহর সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। রাগ-রাগিণীর সংখ্যা এত বর্ধিত হয় যে, তাহাদিগকে ঠাঁই হিসাবে, গাইবার সময় হিসাবে, উত্তর আরব হিসাবে প্রভৃতি নানা উপায়ে শ্রেণী বিভাগ করা। এ কাজটি মুসলমানেরাই করিয়া গিয়েছেন, তাহা না করিলে বর্তমানে আমরা যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাই, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই।[৩৮]

সঙ্গীতে উৎসাহদাতাদের মধ্যে সম্রাট আলাউদ্দীন, আকবর, বাহাদুর শাহ্, মুহাম্মদ শাহ এবং পরবর্তী কালে মেটে-বুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজী স্বয়ং উত্তম গায়ক ছিলেন। বিখ্যাত গায়ক আমির খসরু তাঁর সভাকবি ছিলেন। আমির খসরুর চেষ্টা ও উৎসাহে মুসলমানরা প্রথমে ভারতীয় সঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করেন। তিনি বিভিন্ন রাগের সৃষ্টি করেন এবং বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। বর্তমান কালে প্রচলিত ধ্রুপদী গান গাওয়া রীতিরও তিনি প্রবর্তক।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজসভা অলংকৃত করেন বিখ্যাত সুর সম্রাট স্বনাম ধন্য তানসেন। তিনিও বিভিন্ন রাগের স্রষ্টা হিসেবে আজও বিখ্যাত। বাদশাহ আকবর স্বয়ং উৎকৃষ্ট পাখোয়াজী ছিলেন। তাঁর আমলে অসংখ্য গুণী গায়ক ভারতবর্ষব্যাপী যশ লাভ করে গেছেন। এসকল গায়ক অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করে গেছেন এবং বিভিন্ন রাগ রাগিণী ও গৎ প্রস্তুত করে সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে গেছেন। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গান বাদশাহী আমলের সৃষ্টি। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এদেশে কেবল ধ্রুপদ গানের প্রচলন ছিল এবং তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে লেখক প্রবন্ধ লেখার সময়কাল (১৯২৭) পর্যন্ত মুসলমানদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকার বিবরণ দিয়েছেন। এবং তদবধি বিখ্যাত গায়ক-বাদক প্রভৃতি বেশির ভাগ যে মুসলমান ছিলেন তা উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে লেখক মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেই যে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগৎ গৌরবময় তেজোময় ও প্রাণময় এক স্বর্ণযুগে পদার্পণ করবে বলে প্রত্যাশা করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার আলেম সমাজের বৃহৎ অংশ সঙ্গীত ও ললিতকলার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে এগুলোর চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।[৩৯] সে-কারণে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে আলেম সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত প্রচারণার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হয়েছিল। কাজী মোতাহার হোসেনের উক্ত প্রবন্ধটি সে-লক্ষ্যেই রচিত। কাজী আবদুল ওদুদও উক্ত অধিবেশনে পঠিত 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা ও সাধনাহীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে' গ্রামের চাষীদের সঙ্গীত রস আস্বাদনের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার চেষ্টাকে নিন্দা করেছেন।[৪০] একই অধিবেশনে আবদুস সালাম খাঁ তাঁর 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।[৪১]

সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশনে মোতাহার হোসেন 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪২] মুক্তবুদ্ধি ও উন্নত চিন্তার স্মারক উক্ত প্রবন্ধেও তিনি মানব জীবনে আনন্দ রস ও চিত্ত বিনোদনের অপরিহার্যতাকে যুক্তিপূর্ণ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেছেন, মুসলমান সমাজে ললিতকলার বিশেষ চর্চা না থাকায় সেখানে আনন্দের উপকরণের অভাব হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু ধর্মান্ধ সমাজের শাসন কারণে-অকারণে

মুসলমানদের আনন্দধারাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। যে কারণে প্রকৃত গৃহ বলতে যা বোঝায় তা তাদের নেই। অশিক্ষা-ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ বাঙালি মুসলমান সমাজ স্থবির ও বিকলাঙ্গ। একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষা ও মানসিক বৃত্তির অসাম্য, পর্দা প্রথার আধিক্যজনিত ব্যবধান প্রভৃতি কারণে মুসলমান সমাজে পরস্পরের ভিতর মনে-প্রাণে, কর্মে-ভাবনায় মিল হচ্ছে না বলেও তিনি মনে করেছেন। তাই তিনি সুরুচিসম্পন্ন আনন্দের সন্ধান ও সম্ভোগ করার মত ক্ষমতা অর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। একাজে সমাজ ও গৃহের যে কোন ধরনের সংস্কারের প্রশ্ন দেখা দিলে তা অকুণ্ঠভাবে করার জন্যও তিনি আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।[৪৩]

উক্ত অধিবেশনের কমপক্ষে আটজন আলোচক প্রবন্ধটির উপর আলোচনায় অংশ নেন। এতে প্রতিকূল সমালোচনা অপেক্ষা অনুকূল সমালোচনাই বেশি হয়। বোঝা যায় তাঁরা প্রায় সকলেই আনন্দ রস পাওয়ার জন্য উৎসাহী ছিলেন।[৪৪]

সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৯২৮) মোতাহার হোসেন 'মানব মনের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক একটি দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি মানবজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনাধারাকে পর্যালোচনা করে তার মনোজগতের পরিচয় প্রদান করেছেন। জীবননির্ভর প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-আচরণকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন। বিভিন্ন দেশের রাশিকৃত স্মৃতি, পুরাণ ও কাহিনীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন শক্তির কাছে অসহায় বোধ করত। আর সে অসহায়তার হাত থেকে মুক্তির আশায় তারা বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে নানা উপাচারে পূজা দিত। কোন কোন সময় তাদের বর লাভও এদের লক্ষ্য থাকত। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রমোন্নতি ঘটায় দেবতার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এ সংখ্যা যত কম হয় দেবতার ক্ষমতাও তত প্রসারিত ও পরিবর্ধিত হয়। অবশেষে মানুষ তখন বিচিত্র বিশ্বে এক পরিপূর্ণ একত্বের সন্ধান পায়; ক্রমে ক্রমে তার মনে একজন দেবতার কল্পনা আসে।

কাজী মোতাহার হোসেন মনে করেন, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র অনন্ত প্রসারিত। তাই অবিরাম চেষ্টায় সে অনবরত সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত। ইতোমধ্যে সে দুটো বিরাট সত্য আবিষ্কার করেছে। প্রথমটি এই...

জগতের সৃষ্টি ও পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে নানা বৈষম্য দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সকলের মধ্যে এক চমৎকার ঐক্য বন্ধন আছে। বিশ্ব যেন এক অখণ্ড বিরাট দেহ, যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একে অন্যের পরিপূরক। দ্বিতীয়টি এই যে, জগতের সমুদয় নৈসর্গিক ও নৈতিক ব্যাপারই অপরিবর্তনীয় কঠোর নিয়মের অধীন।[৪৫] আর এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে এবং বিশ্বের একত্বের প্রেক্ষিতে তিনি এর সৃষ্টিকর্তাকেও একটি মাত্র মহামানব (আল্লাহ) ধরে নেওয়াকেই অধিক যুক্তিপূর্ণ অনুমান হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন (মার্চ ১৯২৯)-এ তিনি 'ধর্ম ও সমাজ' শীর্ষক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি লেখকের দার্শনিক ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় ঋদ্ধ। তিনি বলেছেন, জগতের নানা ঘটনা ও শক্তিপুঞ্জের সামনে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় মানুষ যখন অসহায় বোধ করে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষ আশ্রয় ও সান্ত্বনার সন্ধান করে। এ পর্যায়ে সে সদৃশ যুক্তি দ্বারা এক সর্বশক্তিমান দয়াময় জগৎকারণে বিশ্বাস এবং পরলোকে তাঁর ন্যায়বিচার ও দণ্ডপুরস্কারে আস্থা স্থাপনে বাধ্য হয়। কাজী মোতাহার একে মানব মনের মূল বৃত্তি হিসেবে মনে করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে থেমে যায়। আর বুদ্ধির যেখানে শেষ সেখানেই বিশ্বাসের শুরু। বিশ্বাসের মূলে বুদ্ধির একটা অস্পষ্ট সম্মতি থাকায় মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির প্রসারের সাথে সাথে বিশ্বাসও তাই ক্রম পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় বিশ্বাস তাই সেখানকার জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিশ্বাসের সংস্কারের আবশ্যকতা ও অনিবার্যতাকে অনুভব করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস প্রধানত হৃদয়ের ব্যাপার হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রায় অন্ধ ও রহস্যময় হয়। তিনি তাই তাকে (অন্ধবিশ্বাস) সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন :

> সংস্কার যতদিন বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে থাকে, ততদিন সে তাহার জীবন্ত শক্তি-প্রভাবে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সংস্কার যখন বুদ্ধি ও বিচারকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখনই তাহা কুসংস্কারে পরিণত হয়।[৪৬]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতি পরিপন্থী বিশ্বাসের মূলে তিনি সাধারণ লোকের নির্বিকার অনুকরণ প্রবৃত্তি, চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের স্বল্পতাকে দায়ী করেছেন। ধর্মীয় শত শত ফেরকা বা সম্প্রদায়ের উদ্ভবও এর থেকেই উদ্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন, মানুষের মনের মৌলিক

'বৃত্তি' ধর্মকে রূপ দেওয়ার জন্য অনেক সামাজিক নীতি ও রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্ম ও সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সমাজের স্থিতি রক্ষার জন্য তিনি কতিপয় শাসন ও শৃঙ্খলার আবশ্যকতা অনুভব করেছেন কিন্তু ধর্মের পরিধি বাড়িয়ে সমাজ-বিধিকে ধর্মের অন্তর্গত বলে ধরে নিয়ে তার প্রতি মোহকে ক্ষতিকর মনে করেছেন। এ ছাড়া কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাই একমাত্র সত্য এ বিশ্বাসকে তিনি মারাত্মক ভ্রম বলে মন্তব্য করেছেন।

বস্তুত সময়ের পরিবর্তনধারাকে উপলব্ধি করে নতুন জ্ঞানের আলোকে ধর্মগ্রন্থকে দেখার মানসিকতা জন্মে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা দেশ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> ... মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্ম, মানুষের জন্যই সমাজ। ধর্ম এবং সমাজ যদি মানুষেরই অবাধ মুক্তির পথে কন্টক স্বরূপ হয়, তবে তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে।... শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধর্ম ও সমাজের সূত্রগুলি স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতে পারিবে, লোকের উদারতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যক্তিত্বের সম্মানও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইবে। ব্যক্তিত্বের এই পরিপুষ্টের মধ্যেই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ নিহিত আছে।[৪৭]

সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন (মার্চ ১৯৩০)-এ কাজী মোতাহার হোসেন 'ধর্ম ও শিক্ষা' শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৪৮] প্রবন্ধটি কাজী মোতাহার হোসেনের ধর্ম ও শিক্ষাচিন্তার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। মৌলিক ও চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধ হিসেবে এটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ধর্মের প্রতি কাজী মোতাহারের ছিল অবিচল আস্থা কিন্তু তাঁর ধর্মচিন্তা কখনও যুক্তি ও মানসিকতার পরিপন্থী হয় নি, আলোচ্য প্রবন্ধটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মনে করেছেন, মানুষের কল্যাণেই ধর্মের সৃষ্টি, ধর্মের জন্য মানুষের জন্ম হয় নি। কাজেই ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে জীবন চলার পথে যদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ধর্মকে মুক্তবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে। প্রায়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না। আর একে তিনি ধর্মদ্রোহিতা কিংবা ধর্মহীনতার পর্যায়ে বিচার না করতে পরামর্শ দিয়েছেন। মোতাহার হোসেন না বুঝে ধর্মগ্রন্থ পাঠ কিংবা প্রাণের যোগ ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার মধ্যে কোন সার্থকতা লক্ষ্য করেন নি। আরবি ভাষায় নামাজ-পাঠ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> সংস্কৃতে স্তোত্র-পাঠ করা আর আরবীতে নামাজ পড়াই নিয়ম। যার অর্থ বোধ হয় না, যে কথার সহিত প্রাণের যোগ নাই, সেই সব কথায় ভগবানের প্রার্থনা করায় কতটা হৃদয়-মনের তৃপ্তি হয়, তা বুঝে ওঠা কঠিন;[৪৯]

কাজী মোতাহার হোসেন ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব করেছেন। কিন্তু সেজন্য পৃথক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নি। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনি সমাজের জন্য কল্যাণকর ভাবেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'টোল, মাদ্রাসা, হিন্দু কলেজ, ইসলামিক কলেজ' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংকীর্ণতা ও অপ্রেম বিরাজ করে, পরস্পরকে জানবার ও বুঝবার কোন আগ্রহ বা সুযোগ সেখানে নেই। সে-কারণে কোন বৃহৎ চিন্তা ও কর্মের সূচনাও সেখান থেকে আশা করা কঠিন। কাজেই ব্যক্তি তথা সমাজের বৃহৎ স্বার্থে ঐ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বর্ষের প্রথম অধিবেশন (আগস্ট ১৯৩০)-এ কাজী মোতাহার হোসেন 'মানুষ মোহম্মদ' শিরোনামে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি হযরতের জীবনের এমন এক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেন যা সাধারণত মানুষের নজরে পড়ে না। জ্ঞানী, কর্মী, সাধক, সম্রাট, সেনাপতি, ধর্মস্থাপক প্রভৃতি বিষয়ের পরিবর্তে লেখক এখানে 'সাধারণ ভদ্রলোক' হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন সেই আলোচনা করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে হযরত মোহাম্মদ (স) কতখানি রসিক ছিলেন, কথায়-আলাপে তিনি কতখানি হাসি-ঠাট্টা করতেন তার এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। সাধারণত ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কিত যে-কোন মানুষ সম্পর্কে ভাবতে গেলে প্রথমত আমাদের সামনে যে-নীরস, কঠোর জীবন এবং অত্যন্ত গুরুগম্ভীর চেহারা ভেসে ওঠে, তাকে দূর থেকে ভয় করা যায়, হয়ত শ্রদ্ধাও করা যায় কিন্তু আপনার মত করে বোঝা যায় না, ভালবাসাও যায় না। মোতাহার হোসেনের তুলিতে হযরতের জীবন ও চেহারার সে-ধরনের চিত্র অঙ্কিত হয়নি। তিনি মানবতার আর একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরতকে আরও জানবার ও ভাববার সুযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদের চেয়ে মানুষ মোহাম্মদের জীবনের প্রতি বেশি নজর দিয়ে তিনি হযরতের জীবনের অনেক প্রচ্ছন্ন মানবীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করে তুলে মানুষের প্রাণে বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।[৫০] প্রবন্ধটির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন :

> হযরত মোহাম্মদ শেষ পয়গাম্বর কিনা, কোরান ফেরেস্তার মারফৎ অহিরূপে নাজেল হয়েছিল কিনা আজিকার দিনে এসব আমাদের বড় সমস্যা নয়... আমাদের সমস্যা হচ্ছে এই যুগে এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হযরত মোহাম্মদের জীবন ও কোরান থেকে আমরা আমাদের জীবনের কতখানি পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। হযরত মোহাম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের চোখ ঝলসে না দেয়। হযরত মোহাম্মদের জীবনের কোন সাধনা যদি আমরা আমাদের জীবনে না নিতে পরি... তা পরিহার করতে যেন আমাদের এতটুকু দ্বিধা না হয়।[৫১]

আবুল হুসেনও এ বিষয়ে মুক্তবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন :

> হযরতের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারকে Justify করে মুসলমানদের আর কোন লাভ নেই, তাকে বিচার করতে হবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে... ইতিহাসে এক অতীত যুগে ভিন্ন আবেষ্টনে তিনি জন্মে ছিলেন, সেখানে বসে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার থেকে এই যুগে, এই দেশে বসে আমরা কতটুকু আলো পাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা তাই শুধু নেব। তা না করে যদি আমরা পদে পদে তাঁকে Justify করতে যাই তা হলে তাঁকেও বুঝা হবে না, আমরা নিজেরাও শুধু বিড়ম্বিত হব। কোন একটা আদর্শের প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরে থাকা ইসলামের শিক্ষার খেলাপ। মুসলমানের জীবনে প্রতিমা ভঙ্গের শিক্ষা যে শুধু মাটির প্রতিমা ভঙ্গের শিক্ষা নয়... আদর্শের প্রতিমা ভঙ্গেরও বটে। কোন আদর্শের পাষাণ বলে যেন আমাদের পথ আগলে না দাঁড়ায় আমাদের চলতে হবে আদর্শ হতে আদর্শান্তরে।[৫২]

এছাড়া হযরতের জীবনের বৃহৎ অথচ প্রচ্ছন্ন মানবীয় দিককে তুলে ধরে কাজী মোতাহার হোসেন সাহিত্য সমাজের কর্মপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছেন বলে কার্যবিবরণীতে মন্তব্য করা হয়।[৫৩]

পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯৩০)-এ তিনি 'নবীন সঙ্ঘ' শীর্ষক একটি রসরচনামূলক গল্প পাঠ করেন। যৌবনধর্মের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের বিবরণই গল্পটির প্রতিপাদ্য। গল্পটির শিরোনাম 'নবীন সঙ্গ' হওয়ার কারণ, চিরযৌবন লাভ এবং তার সংরক্ষণের জন্য কিছু তরুণ-তরুণীর সমন্বয়ে গঠিত

হয় একটি 'নবীন সজ্ঞ'। মূলত এতে লেখকের রসপ্রিয়তার প্রকাশও লক্ষণীয়। বিভিন্ন অবস্থায় মানব চরিত্রের তথা যৌবনধর্মের বিচিত্র রূপের বিবরণ ফুটে উঠেছে গল্পটির মধ্যে—

> এরা বিবাহের পূর্বে লীগ গঠন করে পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে লেকচার দেয় কিন্তু বিবাহ করলেই জীবন সঙ্গিনীকে অন্তঃপুরচারিণী করে রাখে। কখনও ভয়ঙ্কর বা অদ্ভুতের নেশায় মেতে উঠে বলে, 'বিপ্লব চাই', আবার পরক্ষণেই এর বিভীষিকা চোখে পড়তেই বলে 'বিপ্লব জিনিসটা মানুষের একটি সামাজিক ব্যাধি, আরাধনার সামগ্রী নয়।' কখন বলে আমরা সমাজ-কল্যাণ চাই, art for arts sake মানি না, আবার একটু পরেই বলে, মোটের উপর আমরা কবি বা সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক নই। কখনও বলে প্রাচীনকে ধ্বংস কর, কখনও বলে পুরাতনের সঙ্গে মিশে তাকে সংশোধিত ও সমুন্নত করে সনাতনকে প্রতিষ্ঠিত কর। [৫৪]

যৌবনধর্মের নানারূপ স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও লেখক সবশেষে 'তারুণ্যের জয়' ঘোষণা করেছেন।

সাহিত্য সমাজের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন (এপ্রিল ১৯৩১)-এ কাজী মোতাহার হোসেন 'নাস্তিকের ধর্ম' শীর্ষক আরেকটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এবং ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিচারে আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষ করেন নি। তাঁর মতে আস্তিক যাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলেছেন, নাস্তিক তাঁকে নামান্তরে 'প্রকৃতি' বলেছেন। আস্তিক অর্থাৎ যাঁরা বিশ্বের অণু-পরমাণুতে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন তাঁরা স্রষ্টাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে চিন্ময় পরিচালক রূপে কল্পনা করেছেন। আর প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিকের মতে জড়প্রকৃতির ভিতরই চিন্ময়ত্ব আছে, জড় ও চিৎ একই বস্তুর দুই অচ্ছেদ্য রূপ। কাজেই জড়কে চালিত করার জন্য জড়াতীত স্বতন্ত্র চিৎ পদার্থের বা চিন্ময় পুরুষের কল্পনা করা অনাবশ্যক।

ঈশ্বরকে খুশি করবার জন্য কিংবা স্বর্গলোভে আস্তিক সৎকাজ করে কিন্তু প্রকৃতিবাদী যে দেহলোপের সাথে সাথে সব শেষ ভাবে সে কেন সৎকাজ করবে? এ প্রশ্নেরও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রবন্ধটিতে। তিনি বলেছেন যে প্রকৃতিবাদী সে সাথে সাথে বিবর্তনবাদীও। তাঁর বিশ্বাস প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে চলতে গেলে অশেষ লাঞ্ছনার শাস্তি ভোগ করতে হবে যা নরকেরই তুল্য। সৎ প্রবৃত্তির অভ্যাস করতে মানুষ ক্রমশ বিবর্তনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেছে।

প্রকৃতিবাদীর কাছে এই সব সোপানই সপ্ত স্বর্গ। কাজেই আস্তিকের স্বর্গ-নরকের ন্যায় বিবর্তন সোপানের উঁচু-নিচু ধাপগুলোই প্রকৃতিবাদীর সৎ কর্মের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং দেখা যায় আস্তিক ও প্রকৃতিবাদী উভয়ের মধ্যে কর্ম প্রেরণা বা ধর্মভাবে সত্যিকার কোন পার্থক্য নেই।

বর্তমান প্রবন্ধে লেখক সৃষ্টিকর্তার স্বরূপতত্ত্ব আর ধর্মভাবের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করেছেন। তার মতে স্বরূপতত্ত্ব কর্ম জীবনের ওপর অতি গৌণভাবে এবং সামান্য পরিমাণে ক্রিয়াশীল কিন্তু মনের স্বাভাবিক ধর্মভাবের সাথে ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। অনুষ্ঠাননিষ্ঠাকে তিনি ধর্মভাবের একটি প্রকাশ রূপে স্বীকার করেছেন কিন্তু তার ভিতরকার গূঢ়ভাব হৃদয়কে স্পর্শ করছে কিনা সেদিকে বেশি খেয়াল রাখার তিনি পক্ষপাতী। কেননা আত্মিক উন্নতি বা হৃদয়ের উন্নততর তৃপ্তি না হলে কর্ম ব্যর্থ হয়ে যায়। তাইতো অনুষ্ঠানের অশেষ উপযোগিতা ও অপরিহার্যতা সত্ত্বেও সর্বদেশে, সর্বকালে এর স্বাভাবিক গতি ক্রমিক শুষ্কতার দিকেই। স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও জগতে পাপাচার বেড়েই চলেছে। এর কারণ হিসেবে তিনি মনে করেছেন অধিকাংশ লোকই মুখে বিশ্বাস করে, হৃদয়ে করে না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের যেমন কদর হয় না, বিশ্বাসেও তাই। আপন চেষ্টার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা আয়ত্ত না করলে কোন জিনিসই নিজস্ব হয় না। এসব মুক্তচিন্তা বা বিজ্ঞানের শিক্ষাকে অনেক সময় ধর্মবিনাশী বলা হলেও চিন্তাশীল লেখক মোতাহার হোসেন এরূপ শিক্ষাকেই ধর্মের প্রাণ-সঞ্চারী মনে করেছেন।[৫৫]

সাহিত্য সমাজের ৬ষ্ঠ বর্ষের ৪র্থ অধিবেশন (মার্চ ১৯৩২)-এ কাজী মোতাহার হোসেন 'বাঙালীর সামাজিক জীবন' শিরোনামে একটি সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি অতিসংক্ষেপে এবং সহজ সরল ভাষায় বাঙালি জীবনের একটি জীবন্ত চিত্র তুল ধরেছেন। বাঙালির জীবনের নানাবিধ সমস্যার প্রায় সবগুলোর প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। যেমন হিন্দু-মুসলমান ছেলে শৈশব হতেই পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতে শেখে। এভাবে সংস্কারপ্রিয়তা আর ধর্মান্ধতা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা আর সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের চেয়ে আচারের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছে। রাজনীতিকদের হীন স্বার্থ সিদ্ধির চিন্তাই প্রধানত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী। আর্থিক বৈষম্য উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাভিমানে সমাজের প্রয়োজনে তাল রেখে চলতে রাজি নন। উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা প্রায়ই পুরুষের কর্তৃত্ব

মেনে নেয়ার ভয়ে বিয়ে করতে অস্বীকার করার ফলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। বাঙালির শিক্ষাকেন্দ্রগুলো শহরে না হয়ে গ্রামে হলে সামাজিক উন্নতির পক্ষে তা অধিক ফলপ্রসূ হত। পর্দাপ্রথা যুগের চাহিদা মোতাবেক একটু শিথিল করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধটিতে আলোচনা করেন।[৫৬]

প্রবন্ধটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র বলেন :

> Idea গঠন করাই বড় কথা নয়, কারণ এ প্রকার Idea আমাদের যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে এই Idea -কে কর্মক্ষেত্রে রূপদান করা।[৫৭]

এছাড়া তিনি পর্দাকে জন্মগত অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গেও তিনি উভয় সমাজের নিজেদের অভ্যন্তরীণ হিংসা-বিদ্বেষ ধুয়ে মুছে উভয় সমাজের মিলনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি কাজী আবদুল ওদুদও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন :

> আমরা জানি আমাদের কি অসুখ হয়েছে এবং হয়তবা এও জানি যে কি ঔষধ সেবন করলে আমাদের রোগ সারবে। কিন্তু অগ্রসর হয়ে ঔষধ সেবনের ইচ্ছা হচ্ছে না কারুরই।[৫৮]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অষ্টম বর্ষের তৃতীয় অধিবেশন (নভেম্বর ১৯৩৩)-এ কাজী মোতাহার হোসেন 'কোরানের মোমেন, আল্লাহ ও কাফের' শিরোনামে একটি ধর্মচিন্তামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৫৯] প্রবন্ধটিতে তিনি ব্যাপক পরিশ্রম করে সমগ্র কোরান শরীফ অনুসন্ধান করে কোরানের আলোকে মোমেন, আল্লাহ ও কাফেরের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। যাঁরা আল্লাহ ও প্রেরিত পুরুষে, কৃতকর্মের ফল ভোগে এবং আরও কয়েকটি অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখার সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজ, সদ্ব্যয়, ধর্ম কথার আলোচনা ও ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং অনর্থ বিষয় ও লজ্জাজনক বিষয় থেকে নিবৃত থাকেন তারাই কোরানের মোমেন। আর যিনি নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করে তার মঙ্গলামঙ্গলের বিধান করেছেন, যিনি শাশ্বত-সুন্দর ও অনন্ত অপরিমেয় কঠোর শাস্তিদাতা ও মহান দয়ালু তিনিই কোরানের আল্লাহ। যারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রচারিত সত্য অস্বীকার করেছে, কোরানকে মিথ্যা ও লোক-রচিত গল্প বলেছে, কিয়ামত ও আল্লাহর বিচার সম্বন্ধে বিশ্বাসহীন, স্বাভাবিক ধর্ম একত্বের বিরুদ্ধে চলছে এবং যারা লোক দেখানোর জন্য ধর্মকার্য করে কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকহিত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে কোরান অনুসারে তারাই ধর্মদ্রোহী কাফের।[৬০]

মূলত ধর্মীয় বিষয় নিয়ে প্রবন্ধটি লিখিত হলেও তিনি এখানে গতানুগতিকভাবে বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করেন নি। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে বলা হয়...

> কোরান শুধু নামের মোমেন বা মুসলমান চাহেনা... চাহে কাজের মোমেন ও সাধনার মুসলমান। আর তারাই ফতোয়ার জোরে কাফের হয়ে যায় না। কোরানে কাফের বলার নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।[৬১]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধটি একটি মহৎ উদ্দেশ্যে লিখিত সন্দেহ নেই।

অষ্টম বর্ষের পঞ্চম অধিবেশন (জানুয়ারি ১৯৩৪)-এ কাজী মোতাহার হোসেন 'উৎসব ও আনন্দ' শীর্ষক আর একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে লেখকের সংস্কার-মুক্ত সংস্কৃতিচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধকার এখানে উৎসবকে যেমন মানুষের একঘেয়েমির মধ্যে আনন্দ ও বৈচিত্র্যের সন্ধানদাতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন তেমনি একে তিনি ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্মগত কৃত্রিম বৈষম্য ভুলে মনকে অপরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে তার মাধ্যমে বিমল আনন্দ লাভের সহায়ক হিসেবে মনে করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের পরস্পর পরস্পরের উৎসবাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা এবং তাতে অংশ গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এর মাধ্যমে তারা পরস্পর অন্তরের যোগ স্থাপন করার সুযোগ পাবে বলে তিনি মনে করেছেন। এছাড়া ধর্ম, সমাজ ও জাতি নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করতে পারে এমন সার্বজনীন উৎসব যেমন নবান্ন, ঋতুর প্রাকৃতিক শোভার সাথে সম্পর্ক যুক্ত উৎসবাদিতে সকলকে যোগদানের পরামর্শ দিয়েছেন— যাতে করে মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন জাগ্রত হয়, জগৎ সুন্দর ও শান্তিময় হয়।[৬২]

নবম বর্ষের দ্বিতীয় অধিবেশন (সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)-এর কাজী মোতাহার 'শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য' শিরোনামে একটি সামাজিক সমস্যামূলক বিশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। লেখক মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভিতর দৃঢ় যোগস্থাপনের আবশ্যকতাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। অশিক্ষিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষিতদের বিরাট ভূমিকা আছে। তাই শিক্ষিতরা যেন অশিক্ষিতদের উপলব্ধির অযোগ্য কোন বিষয়ের অবতারণা না করেন কিংবা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির

কামধেনু রূপে ব্যবহার না করেন। দরিদ্ররাই সমাজের অধিকাংশ। তাই তাদের কল্যাণের মাধ্যমেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে বলে তিনি মনে করেছেন। চিরন্তন জ্ঞানের প্রসার দ্বারা অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষক সমাজকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষাকে তিনি মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাই চাকরির প্রত্যাশায় শিক্ষালাভ করাকে তিনি আত্মঘাতী অভিহিত করে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যের উৎকর্ষের মাধ্যমে প্রকৃত আর্থিক উন্নতির পথ সুগম করতে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

কালের ভাবধারায় গতিকে উপলব্ধি করে কোরান-হাদীসের অমূল্য সম্পদকে যুগের চাহিদা মোতাবেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের ক্ষমতা না রাখায় প্রবন্ধকার ধর্মভাষায় শিক্ষিত মোল্লা-মৌলবী ও প্রচারক সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেছেন। ধর্মপ্রভাবিত ও ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজে এদের প্রভাব থাকায় কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মান্ধতার প্রভাবে সমাজের উপর অনিবার্য ভেবে তিনি মৌলবী সম্প্রদায়কে সাধারণ শিক্ষিতদের নিকট যেয়ে বাস্তব ও যুগোপযোগী জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রবন্ধকার সাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতার জন্ম দেয় এমন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। মুসলমান ও হিন্দুর জন্য পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা না করে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান করে তাদের পরস্পরের কালচার সম্বন্ধে ধারণা প্রদানের কথাও বলা হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

এছাড়া লেখক অশিক্ষিত কৃষক সমাজকে ধর্ম-ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরব কাহিনী সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য পীর-পয়গাম্বর এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পুরুষদের চরিত্র অবলম্বন করে নাটক রচনা করে যাত্রা-থিয়েটার ও বায়োস্কোপের সাহায্যে জ্ঞান প্রচার করার জন্য শিক্ষিত মুসলমান সমাজের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর মাধ্যমে তারা চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পাবে বলেও তিনি মনে করেছেন।[৬৩]

প্রবন্ধটির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অনেকে প্রাচীন নবীদের কাহিনী, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের কাহিনী কেমন করে বায়োস্কোপাদিতে প্রদর্শন সম্ভব এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে প্রবন্ধকার বলেন, 'কোহেতুরে আল্লাহর সহিত হযরত মুসার দেখা হওয়া যদি সম্ভবপর হয় তবে তাহার প্রদর্শন করানো যাইবে না কেন?[৬৪]

উক্ত অধিবেশনের সভাপতি কাজী আবদুল ওদুদও বিষয়টি নিয়ে উদ্ভূত বিতর্কে অংশ নিয়ে যুক্তিনির্ভর মন্তব্য করেন। তিনি ইসলামে মূর্তি পূজা রহিত হওয়াকে সাধুবাদ জানান। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে প্রতীক বর্জন সম্ভবপর নয় বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে—

> যাঁহারা নিরাকার আল্লাহর আরাধনা করেন তাঁদের কাছে আল্লাহ নিরাকার হইয়াও ব্যক্তিত্ব সমন্বিত। অবশ্য, উপাসকের অন্তরাত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ধারণারও সম্প্রসারণ ঘটে। সাহিত্যে ও শিল্পে প্রতীকের প্রয়োজন খুব বেশী। সেকালের মুসলমান সাহিত্যিকেরাও প্রতীকের সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে (যেমন ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী)।[৬৫]

সাহিত্য সমাজের দ্বাদশ বর্ষের প্রথম অধিবেশনে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'সঞ্চরণ' গ্রন্থ থেকে 'সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে মোতাহার হোসেনের সাহিত্যা দর্শের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী তা এ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করেছেন সাহিত্যে মানব জীবনের প্রতিচ্ছায়া মূর্ত হয়ে ওঠে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সৃষ্টি আবশ্যক বলে তিনি মনে করেছেন। বাস্তবতার দোহাই দিয়ে যাঁরা সাহিত্যে কদর্যতার সমর্থন করেন, তিনি তাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন বাস্তব সাহিত্য হলেই যে তা কদর্য হবে এমন কথা নয়, কেননা সাহিত্য নির্বাচনধর্মী, তাই যে কোন পরিবেশ থেকে ঘটনা সংস্থান করে তাকে উন্নত রসমণ্ডিত করে তোলা সম্ভব। আর তা নিতান্তই সাহিত্যিকের রুচির ওপর নির্ভরশীল।

'সাহিত্য নীতি-দুর্নীতির বাহিরে; ইহাতে কেবল রসার্থেই রস-চর্চা, সাহিত্যে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নাই, অতএব এক্ষেত্রে নৈতিক হিতমূলক আদর্শের কোন প্রশ্নই উঠে না।'... সাহিত্য সম্বন্ধে এমন ধারণা কিংবা মতবাদকে লেখক ভয়াবহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। রস পরিবেশন ও উপভোগকে সাহিত্যের লক্ষণ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, রস-বস্তু অনাবিল, পঙ্কিলতার সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই, আবার সুরুচি ও সুনীতির সাথেও কোন বিরোধ নেই।

সাহিত্যে শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রতিও তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষত মানব কল্যাণ ও মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির দিক নির্দেশনা অবশ্যই সাহিত্যে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেছেন। তবে স্কুল কলেজ তথা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-রীতির সাথে সাহিত্যের শিক্ষা-রীতির মৌলিক পার্থক্যের কথাও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। কেননা স্কুল কলেজে শিক্ষাই মুখ্য ব্যাপার। আর সাহিত্যের শিক্ষা সাহিত্য রসিকের অজ্ঞাতসারে একবারে মর্মস্থলে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

আত্মাশ্রিত সাহিত্য উৎকৃষ্ট না বহিরাশ্রিত সাহিত্য উৎকৃষ্ট এ দ্বন্দ্বের প্রশ্নে লেখক যুক্তি নির্ভর বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল সাহিত্যই মূলত আত্মাশ্রিত। সাহিত্যিকের অন্তর রসের অভিষেকেই ব্যক্তিগত বস্তু সার্বজনীন এবং ক্ষণকালীন অনুভূতি চিরকালীন সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়। এজন্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য দৃশ্যত বহিরাশ্রিত হলেও গভীরভাবে আত্মাশ্রিত। আর সেজন্যই তা সর্বজনের অন্তর্গ্রাহ্য হবার মর্যাদা লাভ করে।

প্রবন্ধকারের মতে যথার্থ সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিই এক মূল্যবান সম্পদ; দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরেই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। অসাধারণ ক্ষমতা বলে সাহিত্যিক নবতর দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে জগৎকে আদর্শ থেকে আদর্শান্তরের মাধ্যমে প্রগতির পথে পরিচালিত করেন। মোতাহার হোসেন মনে করেছেন সভ্যতার অগ্রদূত স্বরূপ সাহিত্যিক দৃষ্টি ক্রমশ নির্মল থেকে নির্মলতর হয়ে সাময়িক যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে প্রেম ও প্রীতিমূলক আদর্শ মানব সভ্যতার সূচনা করতে সক্ষম হবে।[৬৬]

এছাড়া সাহিত্য সমাজের ৪র্থ বর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠ বর্ষের ৩য় অধিবেশন, ৬ষ্ঠ এবং ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে যথাক্রমে 'সাহিত্যের সাধনা', 'রস রচনা', 'বাংলা সঙ্গীত', এবং 'সাহিত্যিক' শিরোনামে কাজী মোতাহার হোসেনের আরও চারটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।[৬৭]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে পঠিত অন্যের প্রবন্ধের ওপরও কাজী মোতাহার হোসেন বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সমাজ, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নে তাঁর এসব আলোচনার সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত আবদুল কাদের (কাদির)-এর 'পল্লী সঙ্গীতে লীলাবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্যান্যের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচক। লীলা সঙ্গীতে চির-বিরহী আত্মার ব্যথা ও বেদনার কথা ব্যক্ত হওয়ায় তার সাহিত্যিক আবেদনকে তিনি অনাবিল মনে করেছেন। এছাড়া এর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত চাষীদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলে উল্লেখ করে এ জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।[৬৮]

সাহিত্য সমাজের ৩য় বর্ষের ১ম অধিবেশনে পঠিত কালিকারঞ্জন কানুনগোর 'হিন্দী সাহিত্য ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন, মোগল আমলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের একটা চমৎকার মিলনের চেষ্টা করা হত। এছাড়া তখনকার সাহিত্যে সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতির সুরটি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হত বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৬৯] মোতাহার হোসেনের এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন মূলত সমাজ ও মানুষের জন্য।

৭ম বর্ষের প্রথম অধিবেশনে পঠিত সামছুল হুদার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে কাজী মোতাহার হোসেন মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমকালে সাহিত্য সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজ সারথিগণকে পত্রিকার মাধ্যমে আক্রমণের 'Counter attack' করে সামছুল হুদা উপযুক্ত প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। এতে তিনি বলেন, 'আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে কোন কোন যুগে কোন কালে মানুষের তথাকথিত ধর্মের কোন প্রয়োজন ছিল না।'[৭০]এছাড়া নবীরা ধর্ম প্রচার করে অন্যায় করেছেন এবং তাতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ এবং বিড়ম্বিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে অধিবেশনের সভাপতি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সামছুল হুদার 'ধর্মের কোন দরকার ছিল না, কিংবা নবীরা ধর্ম প্রচার করে অন্যায় করেছেন'– এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, সাহিত্য সমাজ যদি ধর্মের Fundamental principlesগুলোকে পরিত্যাগ করবার কথাই প্রচার করতে চায় তবে 'মুসলিম' বিশেষণটি উঠিয়ে দেওয়া উচিত।[৭১] এই পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে কাজী মোতাহার বলেন, 'লেখক জীবনের উপর জোর দিয়েছেন, অবশ্য ইহা ঠিক যে জীবনকে অস্বীকার করে মানুষ চলতে পারে না'। কিন্তু 'ধর্মের কোন দরকার ছিলনা' একথার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, 'ধর্ম সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল। মানুষ অনেক সময় নিজের চিন্তা নিয়ে পথ পায় না, এজন্য পরের সাহায্য নিতে হয়'। তিনি বলেন সত্যিই জীবনের ultimate goal ও inevitable doom-এর কথা ভাবতে গেলে সাধারণ মানুষের ধর্মে মতি হওয়া স্বাভাবিক। তারপর তিনি শহীদুল্লাহ সাহেবের 'মুসলিম' বিশেষণটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন 'আমাদের সমস্যা যতদিকে দেখা দিয়েছে ততদিকে সাহিত্য সমাজ বিষয়বস্তু হিসেবে তা গ্রহণ করবে। মুক্তবুদ্ধি দিয়ে ধর্ম বিচারে অকল্যাণ নেই।'[৭২]

৮ম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত আজহারুল ইসলামের 'আমীর খসরু' নামক প্রবন্ধের তিনি তাৎপর্যপূর্ণ সমালোচনা করেন। তিনি দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বুঝিয়ে দেন যে—

> আমীর খসরু গানের একজন অতি উচ্চ দরের সাধক ছিলেন। এক সময় নাকি গোপন 'জাযাক' নামীয় এক সুবিখ্যাত গায়ককে তিনি তাঁহার গজল-প্রতিভা দ্বারা পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। গানে তাঁহার দুইটি মৌলিক দান আছে। ইমন ও ইমন-কল্যাণ সুর তাঁহারই নিজের আবিষ্কৃত। সাধক হিসাবে তিনি হয়ত বায়েজীদ বোস্তামীর সহিত তুলিত হইতে পারেন।[৭৩]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র কর্মকাণ্ডে কাজী মোতাহার হোসেনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো সমাজের অধিবেশনসমূহে স্বপঠিত প্রবন্ধ এবং অন্যের পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচক হিসেবে তিনি মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক পুরুষ। ষাটের দশকে তিনি সস্ত্রীক পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। একথা ঠিক যে আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেনের মত সেকালের বাঙালি মুসলমান সমাজের দুর্বল স্থানসমূহে তিনি হয়ত প্রত্যক্ষ আঘাত করেন নি। কিন্তু মানব সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন উল্লেখ করে 'মানব মনের ক্রমবিকাশ', 'নাস্তিকের ধর্ম', 'ধর্ম ও সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাকে আদৌ নিরীহ উক্তি মাত্র বলা চলে না। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র অধিবেশনে পঠিত কাজী আবদুর ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান', আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধের পাশাপাশি তাঁর 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে তিনি মুক্তবুদ্ধির পরিপোষক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে এর অবদানকে তিনি সব সময় বড় করে দেখেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন :

> এই আন্দোলনের ফলে নিদ্রিত মুসলমানের চেতনার উদ্রেক হয়েছিল... সেটা লক্ষণীয়। এইটুকু সাফল্য নিশ্চয়ই হয়েছিল। আর, 'হিন্দুরা কাফের দোজগেই যাবে, এবং মুসলমান আল্লাহ ভক্ত সবাই ফেরদৌসে যাবে' এ ধারণারও হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। আল্লাহর চোখে হিন্দুও মানুষ, মুসলমানও মানুষ, তাই মানবিক দয়া-ধর্ম, পরোপকার সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের দ্বারা আল্লাহ সকল মানুষকে বিচার করবেন।[৭৪]

বস্তুত এ-ই ছিল কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনচেতনা। আর এ চেতনা গঠন ও পরিপুষ্টি সাধনে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' যেমন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি সাহিত্য সমাজের উদার মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডকে অভীষ্টে এগিয়ে দিতে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১। আহমদ নূরুল ইসলাম, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', *পাণ্ডুলিপি* (ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত) ১৬শ খণ্ড, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫পৃ. ৯৮, ১০৭; পূর্ববর্তী আলোচকগণ ১৯ জানুয়ারিকে সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠার তারিখে হিসেবে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু কার্যবিবরণী অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারিকে সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠার তারিখ হিসেবে ধরা যায়। কার্যবিবরণীতে বাংলা তারিখ ৩ মাঘ, ১৩৩২-এর উল্লেখ রয়েছে। যা ১৭ জানুয়ারি ১৯২৬-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১

৩। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৪। আবুল ফজল, *রেখাচিত্র,* দ্বি-স, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৪

৫। খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১১২-এ উল্লিখিত হয়েছে সাহিত্য সমাজের কোন সভাপতি ছিল না; কার্যবিবরণীতে দেখা যায় ২য় বর্ষে খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ এবং ৮ম থেকে দ্বাদশ বর্ষ (১১ বর্ষ বাদে) পর্যন্ত প্রতিবারই কাজী আবদুল ওদুদ সভাপতি নির্বাচিত বা মনোনীত হয়েছেন। দ্র. আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত

৬। কাজী আবদুল ওদুদ, 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথা', সংকল্প, বর্ষশেষ সংকলন ১৩৭২, পৃ. ৩৪

৭। মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃ. ১১৩

৮। বার্ষিক বিবরণী, শিখা. ১ম বর্ষ (চৈত্র ১৩৩৩), পৃদ ২২, ২৭

৯। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' পৃ. ৩২

১০। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২

১১। ঐ

১২। কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃ. ১৯৪-১৯৫

১৩। আবদুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ. ১৫-১৬

১৪। আবদুল হক, 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ', সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, মুক্তধারা, ঢাকা দ্বি-স. ১৯৬৮, পৃ. ১২৭-১২৮

১৫। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫০-১৫১

১৬। ঐ, পৃ. ১৩৯

১৭। ঐ, পৃ. ১৯০

১৮। ঐ, পৃ. ১৯১

১৯। ঐ, পৃ. ১২৭, ১৩০, ১৩৮, ১৫৬, ১৫৮, ১৬১, ১৬৬, ১৭৮

২০। ঐ, পৃ. ২০০-২০১

২১। ঐ, পৃ. ১০৪

২২। ঐ, পৃ. ১১৮-১১৯

২৩। আবুল হুসেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', আবদুল কাদির সম্পাদিত আবুল হুসেনের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দ্বি-প্র, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃ. ১৪৬-১৪৭ এবং শিখা, প্রথম বর্ষ, (চৈত্র ১৩৩৩) পৃ. ১১৪-১১৬

২৪। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

২৫। অভিভাষণ, শিখা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৩৭ পৃ. ১০

২৬। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২৭। ঐ, পৃ. ১৫৮

২৮। ঐ, পৃ.১৬১

২৯। ঐ, পৃ. ১৫৯

৩০। ঐ, পৃ. ১২৮

৩১। ঐ, পৃ. ১৮১

৩২। শিখা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৩৭, পৃ. ৪৯-৫০

৩৩। দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণী, শিখা, ২য় বর্ষ ১৯২৮, পৃ. ২২-২৩

৩৪। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৮৪

৩৫। ঐ, পৃ. ১৬৩-১৬৪

৩৬। আবুল ফজল তাঁর 'কাজী আবদুল ওদুদ : সাহিত্য ও জীবন দর্শন' প্রবন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য করেন। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, ঢাকা, ১৯৮১ পৃ. ১৭৩। উক্ত মন্তব্যটি পুনর্বিবেচনার কথা বলেছেন আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১০১

৩৭। ঐ

৩৮। 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান', আবদুল হক সম্পাদিত কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৪

৩৯। কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', শিখা, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩, পৃ. ৩২

৪০। ঐ, পৃ. ৩২

৪১। মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, পৃ. ২৬২

৪২। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৩১। উল্লেখ্য যে, কার্যবিবরণীতে প্রবন্ধটির নাম 'আনন্দ ও মুসলমান সমাজ' লেখা হয়েছে। রচনাবলীসহ অন্যত্র 'সমাজ' এর স্থলে 'গৃহ' লেখা আছে।

৪৩। 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ', সঞ্চরণ, আবদুল হক সম্পাদিত কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৮০-৮৪

৪৪। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

৪৫। 'মানব মনের ক্রম বিকাশ', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৪৬। 'ধর্ম ও সমাজ', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৪৭। ঐ, পৃ. ১৪৪

৪৮। আহমদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৪৯। কাজী মোতাহার হোসেন, 'ধর্ম্ম ও শিক্ষা', শিখা, চতুর্থ বর্ষ ১৩৩৭, পৃ. ৪৮

৫০। 'মানুষ মোহম্মদ' সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৬২

৫১। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৫৯

৫২। ঐ, পৃ. ১৫৯-১৬০

৫৩। ঐ, পৃ. ১৫৯

৫৪। 'নবীন সঙ্ঘ', সঞ্চরণ, প্রাগৃক্ত, পৃ. ৩০

৫৫। 'নাস্তিকের ধর্ম', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৩৫

৫৬। 'বাঙালীর সামাজিক জীবন', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-১০২

৫৭। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৭৫

৫৮। ঐ, পৃ. ১৭৫-১৭৬

৫৯। ঐ, পৃ. ১৮৬-১৮৭; উল্লেখ্য যে, কার্যবিবরণীতে প্রবন্ধটির নাম 'কোরানের কাফের মোমেন ও আল্লাহ' লেখা হয়েছে। রচনাবলীতে 'কোরানের মোমেন, আল্লাহ ও কাফের', লেখা আছে।

৬০। 'কোরানের মোমেন, আল্লাহ ও কাফের', প্রবন্ধাবলীঃ সংযোজন, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী, ৪র্থ খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৭৩-২৮৭

৬১। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৮৭

৬২। 'উৎসব ও আনন্দ', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২

৬৩। 'শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৯৩

৬৪। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৯৯

৬৫। ঐ, পৃ. ১৯৯

৬৬। 'সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব', সঞ্চরণ, প্রাগুক্ত পৃ. ১১০-১১৫

৬৭। আহমদ নূরুল ইসলাম, পৃ. ১৫৪, ১৭৪, ১৭৮, ১৯৬

৬৮। ঐ, পৃ. ১৩৭

৬৯। ঐ, পৃ. ১৪১

৭০। ঐ পৃ. ১৮০

৭১। ঐ, পৃ. ১৮১

৭২। ঐ. পৃ. ১৮১

৭৩। ঐ পৃ. ১৮৯

৭৪। সাক্ষাৎকার, সাপ্তাহিক *বিচিত্রা,* ৭ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১১ আগস্ট, ১৯৭৮, পৃ. ২৪